শিক্ষা বিস্তারে রাসূলুল্লাহ'র (সাঃ) অবদান

এ পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছেন ও আসবেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্বিক বিবেচনায় নিষ্কলুষ মহামানব আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তিনি ছিলেন অতুলনীয় অনন্য ব্যক্তিত্ব। পৃথিবীর মানব জাতি যখন অন্যায়-অবিচার, মারামারি-কাটাকাটি ও এক আল্লাহকে ভুলে বিভিন্ন ধরনের পূজাসহ নানাবিধ পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল, তখন মানব জাতির পথের দিশারী হিসাবে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে। তিনি ছিলেন উম্মী, লেখাপড়া জানতেন না, তাঁর লেখাপড়া না জানার মধ্যেও একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ছিল। তিনি হলেন সাইয়িদুল মুরসালীন- তিনি আবার কাকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করবেন? মানব শিক্ষক থেকে ভুল-ভ্রান্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে; তাই এ মহামানবের শিক্ষকের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই। যাতে তিনি এক অনন্য নির্ভুল শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন এবং মানব জাতিকে সার্বিক পথের দিশা দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রতি প্রথম যে বাণীটি নাজিল করেছিলেন তা ছিল। ইক্বরা "(পড়ুন)"- পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতটি শিক্ষার আদেশ হওয়াটাই শিক্ষার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা বর্ণনায় যথেষ্ট।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বড় হতে পারে না। শিক্ষা হচ্ছে দেশ ও জাতির উন্নতির পূর্বশর্ত। তাই আল্লাহপাক তাঁর প্রেরিত মহান ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিজ ব্যবস্থাপনায় উচ্চতর শিক্ষা, বিশুদ্ধ ভাষাজ্ঞান ও বাক নৈপুণ্যতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করেছিলেন, যা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। মানুষ আল্লাহর খলীফা, তাঁর খেলাফতী পরিচালনার ক্ষেত্রে যেটার বেশী প্রয়োজন সেটা হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করে তাঁকে সর্বপ্রথম ইলম বা শিক্ষা দান করেছিলেন। যার কারণে তিনি ফেরেশতাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া নবী রাসূলগণ শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, মানব জাতিকে শিক্ষা দেয়া ছিল তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি শিক্ষক হিসাবে ও শিক্ষা বিস্তারে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন- যার বদৌলতে সমাজ এক অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করেছিল— দূর হয়েছিল আইনের অপব্যবহার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্য।

সেকালে সমাজে শিক্ষার খুবই অভাব ছিল, ঐতিহাসিক ওয়াকীদির বর্ণনা মোতাবেক, ইসলামের আবির্ভাবের সময় মক্কা শহরে লিখতে জানার মত লোক ছিল মাত্র ১৭ জন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে খুব অল্পদিনের মধ্যে সেখানে শিক্ষিতের হার এমনিভাবে বেড়ে গিয়েছিল, যা ইতিহাসে বিরল। তিনি আরব জাতিকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন, যার সুবাদে তাঁরা পৃথিবীর বুকে এক সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জাতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভালভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে অন্যায়-অবিচার, মদ-জুয়ার সঙ্গে পরিচিত ও নানাবিধ পাপাচারে নিপতিত জাতিকে সুশিক্ষিত করে তোলা ছাড়া অন্য কোনভাবেই তাদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার মানসে সর্বপ্রথম মক্কায় সাফা পর্বতের পাদদেশে যায়িদ বিন আরকাম (রাঃ)-এর বাড়িতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত এ বাড়িতে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিল। ইতিহাসে এ বাড়িটি দারুল আরকাম নামে সুপরিচিত। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আর ছাত্র ছিলেন হযরত সাহাবায়ে কিরামগণ। আল্লাহ প্রদত্ত ইলমের অধিকারী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত হয়ে জ্ঞানের আভা লাভ করে তাঁরা বিশ্বে এক অনন্য পদমর্যাদা হাসিল করেছিলেন। সে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাঁরা এক আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণাসহ অন্য কারো কাছে মাথানত করতেন না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন না। তাঁরই উপর সর্বাবস্থায় নির্ভর করতেন, সাহায্যদাতা হিসাবে শুধু আল্লাহকেই বিশ্বাস করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামদের প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন শিক্ষা বিস্তারের প্রতি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, বদরের যুদ্ধে পরাজিত অমুসলিম বন্দীদেরকে ১০ জন করে মুসলিম শিশুকে শিক্ষা দেয়ার চুক্তিতে তাদের মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। তখন কিন্তু মুসলমানদের টাকা-কড়ির খুবই অভাব ছিল না। ছিল তাদের পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী, আর না ছিল যুদ্ধের হাতিয়ার। তবুও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভব করেছিলেন সাহাবায়ে কিরামগণসহ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)।

মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেদের বাসস্থানের চিন্তা না করে সর্বপ্রথমে নির্মাণ করেছিলেন মসজিদে নববী। যার একটি অংশ মাদ্রাসা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এখানে মুসলমানদেরকে কুরআন-হাদীসসহ অন্যান্য জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে পাঠদান করা হতো। এ মসজিদে নববী শিক্ষা বিস্তারে এক অনন্য ভূমিকা রেখেছে। শিক্ষার প্রতি ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে- সকলের উপর বিদ্যার্জন ফরয করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "প্রত্যেক মুসলিম

মুহাম্মাদ আবদুর রব মিয়া আলবাগদাদী

নর-নারীর ওপর বিদ্যার্জন করা ফরয"। (ইবনি মাজাহ)। অন্য হাদীসে আছে ঃ 'তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম হাসিল করো।" ইসলামে ইলম হাসিলের মর্যাদা অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন এবং অধিক ইলম হাসিলের জন্য তাঁর সমীপে দু'আ করতে শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলেছেন ঃ "হে রাসূল (সাঃ) আপনি বলুন ঃ হে আমার প্রতিপালক আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন। সূরা ত্বাহা ঃ ১১৪।

ইলমধারীদের মর্তবা বর্ণার্থে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানদারদের এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। সূরা মুজাদালা ঃ ১১। অন্য আয়াতে আছে "আর যাকে হিকমত (বিশেষ ইলম বা বিশেষ জ্ঞান) প্রদান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। সূরা বাকারা ঃ ২৬৯। ইলমের অধিকারীরাই শুধু আল্লাহকে জানেন ও চিনেন। তারাই মূলত আল্লাহকে ভয় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন ও ভয় করে থাকেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী ঃ বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে প্রকৃত আলিমরাই তাঁকে ভয় করেন। সূরা ফাতির ঃ ২৮। আর ইলমের মাধ্যমেই মানুষ সম্মানিত হয়, ইলমের অধিকারী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে বেশী ভয় করেন; এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী (যে আল্লাহকে বেশী ভয় করেন)। সূরা হুজুরাত ঃ ১৩। একথা ভাল করে মনে রাখতে হবে যে কুরআন ও হাদীসে যে শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে তা হচ্ছে এমন ইলম, যার মাধ্যমে আল্লাহকে চেনা যায়, আল্লাহকে বোঝা যায়, এমন ইলম অবশ্যই নয়- যা আল্লাহকে ভুঁলিয়ে দেয়, আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে দূরত্ব কায়েম করে। মুসলমানদের আজ সে শিক্ষা গ্রহণের সময় এসেছে, যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথীরা বিশ্বের বুকে এক অপূর্ব নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতা, বৈষম্যহীনতার শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়ার বুকে এক অনন্য আদর্শ কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আজ মুসলমানগণ সে শিক্ষা ভুলে অমুসলিমদের লেজ ধরে শয়তানী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া আদর্শ উপেক্ষা করে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে যার প্রভাবে আজ দুনিয়া মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহে নিমজ্জিত। এ জগৎ থেকে শান্তি বিদায় নিয়েছে, শান্তির নীড় কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, চারদিকে শুধু অশান্তি আর অশান্তিতেই বিরাজমান।

পরিশেষে এ কথা বলা যায়, ১৪১৭ বছর পূর্বের দেয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া আদর্শ পালনের মাধ্যমেই আবার ফিরে আসতে পারে শান্তি ও সুখ। তাছাড়া অন্য কোন গতি নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেয়া শিক্ষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আবার ফিরে আসবে এ দুনিয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলা। আল্লাহ আমাদেরকে সার্বিক ইলম হাসিলের তাওফিক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

(পিআইডি ফিচার)